KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩৭ প্রিন্সিপ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 1/2	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২১
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

দ্বিতীয় সংখ্যা] জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক ঃ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সাহিত্য-সম্মিলন

গত সাহিত্য-সম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে,—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে কখনও শোনা যায়নি তা নয়; তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর পাঁচটি বিবাদী সম্বাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তা কোমল নয়—তীব্র।

এবারকার ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের, প্রচলিত প্রথা মত—"আসুন বসুন" বলে' সম্ভাষণ করেননি; "উঠুন চলুন" বলে' অভিভাষণ করেছেন! এঁরা সকলেই গলার আওয়াজ আধসুর চড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলেছেন যে—"এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ।" এই দেশব্যাপী

মিথ্যার হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারি সন্ধান বলে' দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্য্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিথ্যার চর্চ্চা লোকে দু'ভাবে করে,—এক জেনে, আর এক না জেনে। সত্য যে কি, তা জেনেও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন,—অন্ততঃ ওর কোন টোট্‌কা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে অনেকে কেবল মাত্র মানসিক জড়তাবশতঃ, ও-বস্তু যে কি, তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখপাত্রেরা, যাদের মনের সর্ব্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে, সেই শ্রেণীর লোকদের উপদেশ দিয়েছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

এঁরা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান,—সত্যের জ্ঞানে; আমাদের উঠে চল্‌তে বলেন, সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্ত্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য। কোনও জিনিষ দেখ্‌তে হলে, জাগা অর্থাৎ চোখ-খোলা দরকার, আর কোন জিনিষ খুঁজতে হলে, ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এঁরা আমাদের "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চান্। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে রাজি হব কিনা জানিনে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

লোকপ্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপাত করে না। পাঁঠা যে ওসব কথা কানে তোলে না, তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্য-যজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের

মন্ত্র,—সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এঁরা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মত কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ-চতুষ্টয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অভিভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে—

"বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।"

এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি, কিন্তু পুরাকালে বালক অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে', দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিত পালিত হয়ে, এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন কি, ইউরোপবাসীরা এখন আর তাঁকে সাম্‌লে উঠতে পার্‌ছে না। এই কারণেই, যিনি স্থলপথে বিলেত চলে গেছ্‌লেন, তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনও অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলেরই আশা করেন। কেন? তা তিনি স্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপগুণের যে শাস্ত্রসঙ্গত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।

ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,—

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন সত্য তিন প্রকার :—

(১) পারমার্থিক সত্য = তত্ত্বজ্ঞান = পরাবিদ্যা।

(২) ব্যাবহারিক সত্য = বিজ্ঞান = অপরাবিদ্যা।

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য = ভ্রমজ্ঞান = অবিদ্যা।

বিজ্ঞান বল্‌তে একালে আমরা যা বুঝি, সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক আলোচনা করা কঠিন; কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। নব্যমতে জ্ঞান এক,—শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করে'ও, জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখান যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।

ঠাকুরমহাশয় পূর্ব্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন :—

"বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।"

অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ড-সত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান,—আর যার দ্বারা বহু খণ্ড-সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান, এই মনে করে' যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে

রাখবার জন্য এঁদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদবেদান্তে নেই; বরং উপনিষৎ-কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে, পরাবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করলে, বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম-জ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান;—বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ড-সত্যের উপর যদি এক মোট-সত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তাহলে বহু খণ্ড-মিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।

আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক করে নিলেও,—এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে; কেন না বস্তুতঃ ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় এক ভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-একভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলতঃ একত্বের জ্ঞান। অপরপক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারি জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জান্‌তে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে, কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই; ভয় আছে শুধু মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের। যাঁরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে চান, তাঁরাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্রমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগ্‌তে পারে যে, কি করে' একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে মিথ্যা,—এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারি সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা ও সূর্য্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য; অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাঙ্গলা দেশে চোখে দেখা যায়, তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আর নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চেপ্টা—গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে', অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান,—অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যোগাযোগ করে' সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চেপ্টা-খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং কোনও একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করান যায় না।

ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণতঃ মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে—কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখ্‌তে চায়; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তু সকলকে পৃথকভাবে না দেখে, যুক্তভাবে দেখ্‌তে গিয়ে, বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চেপ্টা, ও সূর্য্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে এ দু'টি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এ দু'টি হচ্ছে এক সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী নামক মৃৎ পিণ্ডটি যে কারণে সূর্য্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ, বা চতুষ্কোণ কিম্বা চেপ্টা হ'লে, ও-ভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হ'ত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই; কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তুজগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে না; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না, অর্থাৎ কাব্য শিল্পও মারা যাবে না। যা' তত্ত্বজ্ঞানও নয়, বিজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়,—তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা; এবং তারি চর্চ্চা করে' আমরা ধর্ম্ম, সমাজ, কাব্য, শিল্প,—এক কথায় সমগ্র মানবজীবন সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।

(২)

বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের নাম নয় ;—একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে' যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারি নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধাসাধি করিনে, সে কখনই এদেশে ফিরে আসবে না, যদি না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বল্‌তে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্ব-জ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে—"এক সত্য",—অথচ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানীরাও অস্বীকার কর্‌তে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন—যা পূর্ব্বে এক ছিল, তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙ্গাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক পৃথক বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা,—জড়-জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে, একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মত সমষ্টি গড়ে' তোলা। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ কর্‌তে হলে আঁকযোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আর-যে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়—পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপযোখও করা চাই। বিনা মাপে, বিনা আঁকে যে

সত্য পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক-সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্য্যাদা, গৌরব ও মূল্য,—তা সবই এই পদ্ধতির দরুণ। আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে, তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মত,—এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য ; কিন্তু কি মাপযোখের, কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে, ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া,—অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে, যে-খুসি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয়ে ভুল বেরচ্ছে, আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়, ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও, একটি উপ-বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এক্ষেত্রে মৈত্রমহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে' অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল, নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেই সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতিহাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল-সময়ে মাটির উপর পড়ে'-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে' উদ্ধার কর্‌বার জিনিষ ; কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়,—বর্ত্তমানে তা ঢাবা পড়ে' থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌বার অর্থ হচ্ছে অদৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য পুরুষকার চাই। তাই মৈত্রমহাশয়, কেবলমাত্র ভক্তি-

ভরে অতীতের নাম কীর্ত্তন না করে, তার সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌বার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শমত কাজ কর্‌তে হলে, আমাদের করতাল ভেঙ্গে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যে সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে, আগে তা খুঁড়ে বার কর্‌তে হবে, পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে' সাহিত্য-সমাজে প্রচলন কর্‌তে হবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্রমহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশঃ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্ত্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে—মৈত্রমহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে, একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।

সে যাই হোক, মৈত্রমহাশয় আমাদের আর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না কর্‌তে পারলে, কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা কর্‌তে হলে, আমাদের অসংখ্য মানসিক আলস্য-প্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ কর্‌তে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিম্বদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।

শুধু রূপকথা নয়, সেই সঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা কর্‌তে হলে সে রচনায়, "শব্দের

লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য্য, ভাষার চাতুর্য্য" পরিহার কর্‌তে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চল্‌বে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু, অপরকে যে উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে উপদেশ অনুসরণ করেন নি, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে "অক্ষর-ডম্বর", এ কথা টাউনহলে সশরীরে উপস্থিত থাক্‌লে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার কর্‌তেন। সম্ভবতঃ অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।

(৩)

যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ কর্‌তে পারেননি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মত সহজ হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণগন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।

আমি বহুকাল হতে এই কথা বলে আস্‌ছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্ব্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন্। এঁদের মতে, বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে

ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না; সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোষাকী ভাষা তৈরি করা চাই। পোষাক যখন চাইই, তখন তা যত ভারি আর যত জমকালো হয়, ততই ভাল। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা জরিতে কিংখাব বুনতে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি ঝুঁটা, তা দিয়ে তাঁরা কিংখাব দূরে থাক্ দোসুতিও বুন্‌তে পারেন কি না,—পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না,—এ সব বিচার করবার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাঙ্গলা লিখ্‌তে বল্‌লে তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তাঁদের কাব্যের বস্ত্রহরণ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনও গর্হিত আচরণ কর্‌তে চাইনে তার প্রমাণ,—ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ কর্‌বার জিনিষ নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ,—আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বলে "কাব্যশরীর"। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙ্গালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেহ প্রবেশ করিয়ে দিলে, ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ ভূপতির দেহে প্রবেশ করে' যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল,—সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করায় তার যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস কথাসরিৎসাগরে দেখতে পাবেন। বাঙ্গালীর স্কুলে-পড়ানো আত্মা কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে' পরের পঞ্জরে প্রবেশ লাভ কর্‌বার জন্য ছটফট কর্‌ছে, তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয়ই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনও ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন।"

আমরাও তেমনি বাঙ্গালী জাতির অজ্ঞান অবতার,—সম্ভবতঃ গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে;—কেননা সত্য লাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাসই জাতির পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার, মনের ও চরিত্রের জ্ঞান হারিয়েছি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক "আর্য্য" শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গেলে, বাঙ্গালীর ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হবে; কেন না আমরা মোক্ষমূলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য্য নই। আমরা একটি মিশ্র জাতি। প্রথমতঃ দ্রবিড় ও মংগলের মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয়। তারপর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্য্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' আমরা একেবারে আর্য্যমিশ্র হয়ে উঠিনি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্য্য-সভ্যতা, আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গলায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন—

"এই সকল আবর্ত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী"।

এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবতঃ আমি এই ক্রমাগত আর্য্য আবর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ;—কেন না আমি ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গলা ভাষা, আর্য্য ভাষা নয়,—উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা,—এক কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙ্গালী জাতিও আর্য্যজাতি

নয়,—একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী-খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য্য-সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমতঃ ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হলেও, বড় বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? ও ত খাদ নয়,—ওই ত হচ্ছে বাঙ্গালীজাতির মূল ধাতু! এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিম্বা উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়, তা যিনিই বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন, তিনিই মানেন। কাঁঠাল আম নয় বলে' দুঃখ কর্‌বারও কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বসাবার চেষ্টা কর্‌বারও দরকার নেই। আমরা এই বাঙ্গলার গায়ে হয় ইংরাজি, নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে, সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কাঁঠালের আমসত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙ্গালীজাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যেরা সব সহজিয়া মতের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে', যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জ্জন করি। আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি, আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্য্যামী করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারলে, আমরা আবার সহজ অর্থাৎ natural হতে পারব। মনের এই সহজ-সাধন অতি কঠিন ব্যাপার; কেননা আমাদের সকল শিক্ষা দীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।

(৪)

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নমহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে—

"আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙ্গাইতে হইবে।"

এ যে শুধু কথার কথা নয় তার প্রমাণ, কি করে' সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারা যায়, তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মোট কথা এই যে, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা না কর্‌লে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে "সাহিত্য" শব্দের অর্থ সাহচর্য্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কিসের সাহচর্য্য? তার উত্তর—সকলপ্রকার জ্ঞানের সাহচর্য্য; কারণ অতি প্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য, অর্থাৎ ছেলেমানুষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে কালিদাস প্রভৃতি বড় বড় সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ শকুন্তলা,—অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা সংস্কৃত কাব্য আধ বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে' গণ্য করি, আর ধর্ম্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।

সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিন্‌কালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ কালিদাস, দান্তে, মিল্টন, গেটে প্রভৃতি। তবে পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ বোঝায়, তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি; কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য

প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে Synthetic Culture, তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাক্‌লে, কোনো বড় ইংরাজ কবি কিম্বা নভেলিষ্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে আর পাঁচজনের মনের আর পাঁচ রকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যাঁর মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না—সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক্ আর আধিভৌতিকই হোক্—তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে' তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশী বিলাতি সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞান অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলস্যপ্রিয় বাঙ্গালীমনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরাম-জনক বিশ্বাসসকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত হবে না,—আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলঙ্কার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।

(৫)

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের ফলে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়,—তা হলে বঙ্গসাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুই পুষ্ট হবে।

সে মিলন যে কবে হবে তা জানিনে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে,—এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না; কারণ, সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মান-মন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙ্গা চাই।

আমি বৈজ্ঞানিক নই,—কাজেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্যেরা কেউ দুটি ভাল কথা বলেননি। তাই আমি তার স্বপক্ষে কিছু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূল জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে হলে, ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কাণা, কান থাকতেও কালা,—অথচ মুখ না থাক্‌লেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাঙ্গলা-সাহিত্যের কোন মর্য্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে হলে, ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে' তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে। অপরপক্ষে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকলেও, যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না করতে পার্‌লে, কোনও পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ, সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা কর্‌বেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে। কারণ

কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনও সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্ব্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন কর্‌লে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন কর্‌লে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনও পদার্থকে এক-হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোঁজে, সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক কর্‌তে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র,—হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে, তাকে আগে ভাঙ্গে, পরে আবার যোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে,—আর না হয়ত একভাগ অক্সিজেন আর দুভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে', সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে হাইড্রোজেনে পুনর্ম্মিলন করে দেয়।

কিন্তু আমরা এক-নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান;—এ জ্ঞানও একের জ্ঞান,—অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এ কথা তাঁরি কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেন না কোনরূপ আঁকের সাহায্যে কিম্বা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই,—সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই,—এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই। এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনরূপ স্বার্থসাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুঁজি, তা কখনও সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনও অহৈতুকী হ'তে পারে না। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজ সাধন, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন;—কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের চর্চ্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি কর্‌তে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব, বিজ্ঞানের পাকাখাতায় পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মূলে যে চির-রহস্য আছে, তা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপরপক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্ত্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলা ছন্দ *

* * * আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে;—ইহা আমি অনেক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরাজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (Sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের

* কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্সন, আই, সি, এস মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে অধ্যাপকমহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত। বাড়ির কর্ত্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায় আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না কিন্তু এই সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভাল করিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছ-বিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝাল-মসলা বেশী করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা, পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথী রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

"অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।"

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্ত্তৃক পরম-প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

"পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।"

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন-কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে ত প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা। সকল শব্দই মাথায় সমান। বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ;—কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না।

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল-ক্ষেত্রে নদীর ধারা

যেমন স্বচ্ছন্দে চারিদিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সম-মাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজন মত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মত হইয়া পড়ে। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।

"কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

"পুণ্যবান" শব্দটি "কাশিরাম" শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হাল্কা ও ভারি দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে। যে সভায় চৌকি পাতিয়া মানুষ বসে, সেখানে প্রত্যেক চৌকির পরিমাপ সমান, সেই চৌকিতে যে মানুষগুলি বসে তাহারা মোটাই হউক, আর রোগাই হউক, সমান জায়গা জোড়ে। কিন্তু ফরাসের উপর গায়ে গায়ে যদি বসিতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক আপনার দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণমত স্থান

দখল করে। আমাদের পয়ার ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে কিন্তু সেই জন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি, ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে, যথা ঃ—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়, যেমন ঃ—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি!

কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা ঃ—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড় উড় এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি "মানসী" নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্ত-বর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগান হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না; কিন্তু "কর্চ্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেই জন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মত মোটাসোটা

গোলগাল ; চর্ব্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্য-সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশী বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো-গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মত পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই ;—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মত চলে—তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চল্‌তি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বেগো ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙীন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি একমাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশীর ফাঁকগুলি শিষা দিয়া ভর্ত্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক ; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি ; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না। * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা চলি সমুখ পানে

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে ?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য্য।

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর গিরি করবরে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।

আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে',
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সেই জন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি; এফ,এ, পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নর-মাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা, সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্ব্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ

বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌টবুক্‌ কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু এ কি করিতেছি? এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম? মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই ত জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু

যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে,—আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকাল বেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোট ছিল। অথচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী—দেশের প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিষ আমাদের সমাজে সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর অন্তে এক এক বছর করিয়া বড় হইতেছে তাহা আমার শ্বশুরের

চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না, যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ,—এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক কিন্তু আমি বলিতেছি সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, এইবার সত্যিকার পড়া পড়—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া!

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া, খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কম্পানির জবড়জঙ্গ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি সাড়ি। কিন্তু সমস্তটি লইয়া কি যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না! যেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগকাটা

শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া; আর গালিচার উপরে সাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল—দুটা তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায় শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সামনে একটা অকাল চার পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্ব্ব লগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি;—আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্!

বিবাহ-সভায় চারিদিকে হট্টগোল—তাহারি মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে! আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। কাহাকে পাইলাম? এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে?

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশঙ্কর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার ইহার বেশি আশীর্ব্বাদ আর নাই।

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, বেহাই মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন, বলিলেন, বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।

মেয়ে বলিল, তাই বই কি! কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল তাহার প্রতি তাঁহার

বিশেষ আসক্তি; বাপকে সেই সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল—বাবা তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?

বাবা হাসিয়া কহিলেন, মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কি হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক্ কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়া মমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘট্‌কালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন—সংসারে তোমার ত ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরি পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও!

তিনি বলিলেল, যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মত এমন বিড়ম্বনা আর নাই।

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলিলেন—আমার মেয়েটির বই পড়িবার সখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড় ভালবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন?

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক

হইতে অর্থ সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন তাঁহার মেজাজ এত খারাপ ত দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনি ভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইঁহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই ত বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহ-সভাতেই বুঝিয়াছিলাম দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয় অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু সে যে আমার সাধনার ধন ছিল—সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে ত এটা তাহার নাম নয় তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্য্যের মত ধ্রুব—সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কি হইবে গোপন রাখিয়া—তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কি অকলঙ্ক শুভ্র সে, কি নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড় মেয়ে, কি জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে! কিন্তু অতি অল্প দিনেই দেখিলাম মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার শাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ ত গেল একদিকের কথা—আবার অন্যদিকও আছে—সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি,—ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে—তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখটাকার গুজব ত একেবারেই ফাঁকি!

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণসম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে বাবার একটা ধারণা ছিল আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রীগোছের একটা কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাষ্টার; —সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা! বাবার বড় আশা ছিল শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূরসম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।

আর এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপূ বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন ?

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—ওমা, সে কি কথা ! বৌমার বয়স সবে এগারো বই ত নয়, এই আস্‌চে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দিদিমারা বলিলেন, বাছা, এখনো চোখে এত কম ত দেখি না ! কন্যাপক্ষ নিশ্চয় তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে !

মা বলিলেন, আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না ?

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, নাতবৌ তোমার বয়স কত বল ত।

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না, বলিল, সতেরো।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি জান না।

হৈম কহিল, আমি জানি আমার বয়স সতেরো।

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্ব্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, তুমি ত সব জান ! তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।

হৈম চমকিয়া কহিল, বাবা বলিয়াছেন ? কখনো না !

মা কহিলেন, অবাক্ করিল ! বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে কখনো না !—এই বলিয়া আর একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইসারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল—বাবা এমন কথা কখনই বলিতে পারেন না।

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস ?

হৈম বলিল, আমার বাবা ত কখনোই মিথ্যা বলেন না।

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে ? আমাদের এখানে এ সব চলিবে না বলিয়া রাখিতেছি।

হায়রে তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া ?

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কি বলিব ?

বাবা বলিলেন, মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কি, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সে দিন দেখিলাম শরৎ-প্রভাতের আকাশের মত তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কি সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মত সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, আমি ইহাদিগকে চিনি না।

সে দিন একখানা সৌখীন বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, হৈম, আমার উপর রাগ করিয়োনা। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চ্চনা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল—সে বলিল, মা, বলিয়া দাও কি করিতে হইবে?

ইহাতে কাহারো মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয় কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, ওমা, এ কি কাণ্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে! এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড় বড় দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন্, খৃষ্টানও নন্, হয় ত বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চ্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন শুনাইয়াছেন কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতাসম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালী বাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল—সে আমার ছোট বোন নারাণী। বৌদিদিকে ভালবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এসব কথা সঙ্কোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সঙ্কোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোট কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইসারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারাণীর কাছে শুনিয়াছি শ্বশুরবাড়ির কথা কি লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই? এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম—তোমার বাবার চিঠি আর কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপূর মাথা খাওয়া হইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কি?

সে ত বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালবাসি, তাহার

দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি, এ, ডিগ্রি অকাতর চিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক ত হৈমর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সঙ্কীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে দেওয়া এক একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হূহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কি দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব?

আমাকে ত কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টক-শয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর কাল অন্তরে বাহিরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে! কি নির্ম্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না,—তাহা আমার

নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্ব্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্ব্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম কি করি? শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, বৌয়ের শরীর ভালো নয় তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।

বাবা ত একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব্ব স্পর্দ্ধায় আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তখনি তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলি বৌমা তোমার অসুখটা কিসের?

হৈম বলিল, অসুখ ত নাই।

বাবা ভাবিলেন এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্যে।

কিন্তু হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এ কি? হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর? অসুখ করে নাই ত?

হৈম কহিল, না।

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই বলা নাই কহা নাই হঠাৎ আমার

শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিলেন না, কেমন আছিস? আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—বুড়ি আমার সঙ্গে যাবি?

হৈম কাঙালের মত বলিয়া উঠিল—যাব।

বাপ বলিলেন, আচ্ছা সব ঠিক করিতেছি।

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এবাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা ত ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুসি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেহাই, আমি ত কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—

বাড়ির মধ্যের উপর বরাৎ দেওয়ার অর্থ কি আমার জানা ছিল। বুঝিলাম কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বৌমার শরীর ভালো নাই! এত বড় অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।

বাবা হাসিয়া কহিলেন, হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো ত সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা?

আমার শ্বশুর কহিলেন, জানেন ত উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার—উঁহার কথাটা কি—

বাবা কহিলেন, অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, হৈমকে আমি লইয়া যাইব।

বাবা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—বটেরে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন—স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই ত হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্ম্মের কাছে সত্যধর্ম্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি

দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে? জান তোমরা, যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই ত সেদিন, লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি! বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জ্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত?

পিতায় কন্যায় আর একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এই-বারেও দুই জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারো পরে কি হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয় ত একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে! কারণ, —থাক্ আর কাজ কি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গমনাগমন

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন; এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"সে স্থানে কি দর্শনীয় আছে!" মিশনারিটি সেই ধরণের লোক, গির্জ্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক কিছু! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে—এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম,—ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরী সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছরকতক পূর্ব্বে আমি "পুরীর পত্রে" শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটরগাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয়, পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবী পিয়ানোবাদ্যের টুং টাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে!

সুতরাং মোগলাই জোববার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবী সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয় ছয় কালা আদ্‌মি যে পাল্কী-বেহারা তাহাদের সঙ্গে একেবারে পূব মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম—সুরুচির এবং ভদ্রতার কোন দোহাই না মানিয়া। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন

ঘনাইয়া আসিল যে, মনে হইল, বুঝিবা পাদরী সাহেবের অভিশাপ ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ,—বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মত দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই;—রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা,—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জ্জন স্বপ্নের প্রায়—পাই কি, না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলো'কে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে, সেখানে কিছুই নাই;—অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয় ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারিদিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনিঝিনি,—দূরে অদূরে কাহাদের নূপুর-শিঞ্জিনীর মত তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে,—তাহা কানে আসিতেছে না সত্য; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে,—চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময়ে একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক যাত্রার প্রথমেই এই যে শিশুর মত ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ,—নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ—ইহাতে 'প্রাণ যেন

দুলিতে থাকে,—মনেই আসে না, একা চলিয়াছি! চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত দুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুঘাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে;—মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্র তারকা আচ্ছন্ন; নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি;—কোনোদিকে সাড়া শব্দ নাই! মনে হইতেছে এ কোথায় আসিলাম,—কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে পায়ে অর্দ্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী! এসময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও একটা কিছুকে দেখিবার জন্য, প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাল্কীবাহকদের করুণ ক্রন্দন-গান শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই বা চলিয়াছি তাহা আর মনে আসিতেছে না;—শুধু বোধ হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলি তালে তালে পা ফেলিতেছি—"পহর রাতি, পান বিঁড়িটি! পান বিঁড়িটি, পহর রাতি!"

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর রাতি, পান বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে।

মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে! চারিদিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে;—মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে! কাছে আসিতেছে সকলি--গাছ পালা গ্রাম নদী; কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে,—কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না!

দর্শন আকর্ণন এবং নিরাকরণ—এ তিনের অভাবের মধ্যে 'নিয়াখিয়া' নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চকিতের মত রাত্রির গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায়; পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি,—অদূরে অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোট গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চিরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়া ঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্যময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্য-পথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলি আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলি মনে হয়—আর কতদূর,—আর কত প্রহর--এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব!

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমনি করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনোদিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না,—আপনাকে গুটাইয়াসুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে।

ঘুমাইয়া পড়িবার—আপনাকে এই বিশ্বজোড়া বিলুপ্তির মধ্যে বিনা আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় খোঁয়ারী আসিয়াছে; যেন একটা শীতল মুষ্টি, প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে—জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে—সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ অবসাদ! দেখিতেছি যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই—পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মত নিশ্চল মন, একটা খট্ খট্ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্কীর তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহকদের দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া, আলো-আঁধারের স্রোতের মত, অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, কালো এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্কী নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে! সমস্ত দেহ মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না। চারিদিক এমনি নীরব, স্থির ও স্তিমিত যে, মনে হইতেছে একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্যপটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে! মন্দিরের পিছনে,—আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র কম্পন নাই; তলদেশে,—পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রং হলুদের প্রলেপের মত লাগিয়া আছে —অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত

মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট দেখিতেছি—কিন্তু অবিচল, অবিকল, ছবির মত।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম, পাল্কীতে আসিয়া বসিলাম, বাহক আসিল, পাল্কী চলিল—এত গভীর নীরবতার মাঝখানে, যে, মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌঁছিয়াছি যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে স্থূলে সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কিনা এ কথাটা জানিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু পথ বাহিয়া, পায়ে পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি, সেই সময়ে সহসা খোলকরতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমনি করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল, যে, মনে হইল বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একসময়ে এই শব্দতরঙ্গের ঝনঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রণরণ করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী—আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘাট—পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্ত্তনের সুর, যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মত, আমাদের নিকটে পৌঁছিতেছে—অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে ক্ষণে! পাড়ি দিয়াছি যে-ঘাট হইতে, তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি;—পাড়ি দিতেছি যে-পারে, তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই;—মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে—আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপূর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো—সে এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দহীন ধূসরতার মাঝে, ক্ষণেকের জন্য আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহুপথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তারপরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মত সেইদিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে—নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোতিমন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশেপাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর কালো সমুদ্রের সাদা আলো,—মায়ার প্রাচীরের মত, অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে!

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে। কালোর দুন্দুভি, আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে,—দিকে দিগন্তে, সীমে অসীমে! এই জ্যোতির্ম্ময় ঝন্‌ঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান, শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে—বরুণ দেবতার অনুচরগণের মত, —নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায়! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না!

বালুতট ওদিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এদিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি—আলো-আঁধারের, ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে প্রহর-শেষের নিশ্চল ধূসরতা

দিয়া গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া, যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে—অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী ঊষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে! একাকী এই জন্ম-রহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটিমাত্র বুদ্বুদ—অখণ্ড অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্ করিতেছে! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণ-বিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর জলোর্ম্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া! পূর্ব্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্র-তরঙ্গ বহিয়া তাহারি প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল, রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল; মৈত্রবনের শিখরে কোণার্ক মন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গ দেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি—কত যেন ক্ষুদ্র! সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া, তাহারি শক্তিতে ঊর্দ্ধে বাড়িয়া আপনাকে চিরশ্যামল, চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্দ্ধে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই;—আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

জরাজীর্ণ, বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত আভার মোহ সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন ভাব মনকে যেন লোহার মত শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি—চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াইগণ্ড পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া—মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ-বশে,—চুম্বকের টানে লোহার মত। মন টানিতেছে! ঐ বটচ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ঐ চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ঐ ঝরিয়া-পড়া, ঝুঁকিয়া-পড়া বালুশয়ানে শুইয়া-পড়া রাশি রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতিটির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে-মুহূর্ত্তে কোণার্কের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি মন সকলি, অগ্নিশিখার চারিদিকে পতঙ্গের মত, আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে,—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন—বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্ত্তিহীন অনঙ্গ দেবতার রত্নবেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান্ অশ্বের মত

বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মত,—শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারি শিখরে—এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস-শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি—উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে;—আর একবার সংসারের দিকে, সুরুচি কুরুচি শ্লীল অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্দ্ধ-নিমগ্না পড়িয়া আছে সে—পাষাণী অহল্যার মত সুন্দরী;—নীরব, নিস্পন্দ,—মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তব্যাপী প্রতীক্ষার মত, শতসহস্রের গমনাগমনের একপ্রান্তে, সুদুর্ল্লভ একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

গত মাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনও টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:—

"যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য,—তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটীকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্ত্তাকর্ত্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা সেই টীকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।"

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম, যদি না আমার জানা থাকত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্ত-ঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অসায়েস্তা, অতএব শাসনযাগ্য। এ উভয়কে জুড়ীতে যুতলে আর বাগ মানান যায় না;—অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে, পরে পরাজিত কর্‌তে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে;—অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না! শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা প্রকৃতির ধর্ম্ম মানবধর্ম্মশাস্ত্র-বহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্‌তে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির

উল্টো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এদেশে লোকে যে, যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্ত্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানব-জীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনো রকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান্ যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপর পক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই; বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্চে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্চে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্চে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক দিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে এক-দিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাষ্টার; সমাজে এক দিকে বাল্য-বিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু; ধর্ম্মক্ষেত্রে এক দিকে শুধু "ইতি" "ইতি", অপর দিকে শুধু "নেতি" "নেতি";—অর্থাৎ এক

দিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে;—ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে;—শুধু মধ্য নেই।

বার্দ্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেল্‌লেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে, তা নেই বল্‌লেও, তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বল্‌লেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না এবং আত্মাকে ছায়া বল্‌লেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনও কোনও সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দেই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য্য। গুপ্ত জিনিষের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে, যৌবনকে গোপন করে রাখ্‌তে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life. —ইংরাজি-সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্য্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে-ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ এবং মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিম্বা দ্রষ্টা কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগান এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগান। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে—"যদি বিলাস কলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।" এক কথায়, যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতম-বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ

করে, পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়নি, তা নয়;—তবে ললিতবিস্তরকে আর কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না; এবং অশ্বঘোষের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, যথা, ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না, যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে—রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়ন-ধর্ম্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন করতে পারে না বলে, কিছু বর্জ্জনও করতে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে, কিছু ছাড়তেও পারে না;—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে, এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে

সংস্কৃত কাব্য 'বয়কট' করতে বলছি কিম্বা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে-যৌবন-ধর্ম্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানব-ধর্ম্ম—এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল তাও অস্বীকার করবার যো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে এক-রোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূলশরীরকে অত আস্বারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এতে বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতি-শত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক্, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী; এক দিকে পত্তন, অপর দিকে বন; এক দিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয়;—এক কথায় এক

দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনও পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা!" এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশী অসংযত।

যারা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ—এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন, রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি Solomon। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন এবং তাকে পদদলিত করতেও সঙ্কুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে উঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা

যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাঁটার সময় পাঁকে পড়ে' গত-জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই, যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন, তাহলে তিনি, যে কাব্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা কর্‌তেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাক্‌ত তা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারিনে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে ;—কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক সকলেই এক-মত।

"যৌবন ক্ষণস্থায়ী"—এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সঙ্গীত পরিপূর্ণ।

"ফাগুন গেয়ী হয় বহুরা ফেরী আগ্নী হয়
গ্যায় তো জোবন ফেরি আওত নহি।"

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপশোষ রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার

উদ্দেশ্যেই এদেশে যৌবন, শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্য-বিবাহের মূলে হয় ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্ত্তমান। জীবনের গতিটি উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর সব দেশে, লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারি সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয়, সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয় বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চ্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই অপর সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে, মানব-সমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহঙ্কার করবার আছে এমন ত আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন ;—ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানব-সমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

এ বিচার করবার সময়, এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানব-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও, দেহ মনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে, মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাক্‌লেও, দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পার্‌ব। দেহ সঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন, অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার যো নেই;—কিন্তু একের মনের যৌবন, লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণ-শক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্চে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম্ম, যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্চে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের

গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা—দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণী-জগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্ম-জগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণ-শক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও, আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের অবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে, শৈশব নয়—বার্দ্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের

অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই এক মত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে তার অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে, যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

বীরবল।